প্রায়োগিক বুদ্ধভাবনা

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। মগধাতিপতি দোর্দন্ডপ্রতাপ অজাতশত্রু স্থির করলেন প্রতিবেশী বৈশালী করায়ত্ত করবেন। সেকালে বৈশালী ছিল বজ্জিদের রাজ্য। বজ্জিরা ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক। ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্যময় ভূমিতে প্রজাতান্ত্রিক গণরাজ্যের ব্যবস্থা অত্যন্ত সুপ্রাচীন। যাই হোক, বললেই তো আর যুদ্ধে নেমে পড়া যয় না। তখন অবশ্য মগধই ছিল আর্যাবর্তের যোলটা জনপদের মধ্যে কাগজে কলমে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। কিন্তু কোশল, কাশী আর বুজি -ও কম যায় না। তাই ওজন বুঝে এগোতে হবে। বিশেষত, মহাজ্ঞানী বুদ্ধের পরামর্শ নেওয়া তো একান্তই জরুরী। বলে নেওয়া ভালো, যে অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসে রাজপুরী থেকে 'শোণিতের স্রোতে' বৌদ্ধধর্ম মুছে দিতে চেয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদের, সেই অজাতশত্রুই ততদিনে ত্রিশরণ নিয়েছেন বুদ্ধের, সংঘের ও ধর্মের।

অজাতশত্রুর আদেশে মহামাত্য বর্ষকার রাজগৃহের গৃহকূট পর্বতে বুদ্ধের পদতলে এসেছেন। অভিপ্রায়, বজ্জি উচ্ছেদ ও বিনাশ সিদ্ধ হবে কিনা তা জেনে নেওয়া। সব শুনে বুদ্ধ শিষ্য আনন্দের কাছে জানতে চাইলেন বজ্জিরা কি যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিয়মিতভাবে মিলিত হন। যখন জানতে পারলেন তাঁরা যথানিয়মে সম্মিলিত হন, তখন স্মিত মুখে বুদ্ধ বর্ষকারকে জানিয়ে দেন মগধ যতই ক্ষমতাধর হোক, যতদিন বৈশালীতে যৌথভাবে আলাপ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের প্রথা প্রচলিত থাকবে ততদিন বজ্জিরা অপরিহানীয়। এছাড়া রাজ কোষের অর্থ যথাযথভাবে আদায়, কর্মচারীদের প্রাপ্য বেতনাদি সময়মতো প্রদান, বায়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান - সৎকার ও সমাদর প্রদর্শন, বৃদ্ধদের উপদেশ মেনে চলা, মহিলাদের সম্মান রক্ষা, ধর্মপালনের আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি। জানতে পারেন, বৈশালীর সারন্দদ চৈত্যে অবস্থান কালে বুদ্ধ পরিহানি নিবারক ও শ্রীবৃদ্ধিসূচক যে সপ্তধর্মের উপদেশ দেন, বজ্জিরা তা পালন করে চলেছেন। সব শুনে বুদ্ধ বর্ষকারকে জানিয়ে দেন বজ্জিরা আপাতত অপরিহানীয়।

ইতিহাস জানাচ্ছে— সোজা আঙুলে ঘি না ওঠায় অজাতশত্রুকে আঙুল বাঁকা করতে অর্থাৎ হীনপন্থা নিতে হয়। গুপ্তচর নিয়োগ করে বৈশালীতে প্রজাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অসূয়া, সংঘাত ও দলাদলির সৃষ্টি করেন। প্রজাদের ঐক্যে ফাটল ধরলে মগধের পক্ষে বাকি কাজটা সহজ হয়ে যায়। বজ্জি করায়ত্ত হয় অজাতশত্রুর।

বুদ্ধের গৃহত্যাগ, তপস্যা, সিদ্ধিলাভ, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি সাধারণ্যে প্রচলিত ঘটনাবলী তাঁকে 'বুদ্ধদেব' করে তুলেছে। তিনি ছিলেন মানববসন্তান। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'শ্রেষ্ঠ মানব'। মনে রাখা দরকার, বোধিলাভের পর তিনি লোকালয় ছেড়ে গিরিগুহায় কিংবা নিবিড়তর অরণ্যে সন্ন্যাসজীবনে আগ্রহী হননি। ফিরে এসেছেন লোকালয়ের মাঝে। দেশনা দিয়েছেন 'মজঝিম পাটি পদা' বা মধ্যপন্থার। চরম ভোগ আর পরম ত্যাগের মাঝামাঝি জনগণের পক্ষে আচরণযোগ্য মাঝামাঝি জীবনাচরণের। যাতে সুরক্ষিত হতে পারে রাষ্ট্র, শান্তিপূর্ণ হতে পারে ব্যক্তি তা সমাজ জীবন।

বুদ্ধ নিজেকে কখনও ঈশ্বরের পুত্র বা ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলে পরিচিতি দেন নি। ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মতো, বুদ্ধ কখনই সদম্ভে আরোপ করেন নি নিজের ওপর এমন কোনো মর্যাদা (ঈশ্বরপুত্র, পয়গম্বর ইত্যাদি- লেখক)। তিনি জন্মেছিলেন মানুষের সন্তান হিসেবে। সন্তুষ্ট ছিলেন সাধারণ মানুষ থাকতে এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রচার করেছেন তাঁর সুসমাচার। তিনি কখনও অতিপ্রাকৃত জন্ম বা অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রমানার্থে অলৌকিক ঘটনা দেখান নি (প্রবন্ধ : বুদ্ধ ও তার ধর্মের ভবিষ্যৎ)।

বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়- এই সমষ্টি ভাবনাই ছিল তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রধান আধেয়। আধুনিক অর্থে এমন ভাবনা চালিত রাষ্ট্রকেই তো আমরা বলছি কল্যাণকামী রাষ্ট্র। যে ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে কল্যাণকামী অর্থনীতির। আরো পরে পরে পরিবেশ ভাবনা, মানবাধিকারের মতো নতুন নতুন বিষয় ও ভাবনাক্ষেত্রগুলো ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠছে একবিংশ শতকের পৃথিবীতে।

বৌদ্ধধর্মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হওয়ায় প্রথাগত রাজতন্ত্রের মতো রাজ ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে কিংবা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সিংহাসনে আসীন হন না। বুদ্ধের ধর্মের শরণ নিয়ে মৌর্য সম্রাট অশোক বলেছেন — ''সব মুনিসে পজা মমা।''। রাজ সিংহাসনের জন্য তিনি নিজেকে প্রজাদের কাছে ঋণী মেনেছেন। প্রজাদের ঐহিক ও পারলৌকিক হিতসাধনের মাধ্যমে সেই ঋণ পরিশোধের জন্য সচেষ্ট ছিলেন আমৃত্যু। প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক ডি. ডি. কোশাম্বী অশোকের চিন্তা ও রাজকার্য সম্পাদনায় চুক্তিতত্ত্ব বা .Contact theory -এর বীজ লক্ষ্য করেছেন। ডঃ দীপক কুমার বড়ুয়ার মতে - ''আধুনিককালে রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে যে সকল মতবাদ রয়েছে, সেগুলি থেকে বুদ্ধের অভিজ্ঞতা অভিন্ন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী হবস, লক, রুশো-এর চিন্তা ধারার সঙ্গে বুদ্ধ ভাবনার অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে।'' বৌদ্ধগ্রন্থে রাষ্ট্রের শাসক হিসাবে নির্বাচিত উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'মহাসম্মত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমে সিংহাসনে আসীন এই প্রশাসক প্রজাদের প্রতি দয়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকতেন। এ প্রসঙ্গে পাঠকের ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় নৈরাজ্যমূলক

'মাৎসন্যায়' ব্যবস্থার অবসানের লক্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পালরাজা গোপালকে শাসক নির্বাচনের কথা মনে পড়বে। পালযুগে বাংলার গৌরবময় বৌদ্ধযুগ।

যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বর্তমানে সবচেয়ে আধুনিক ও গ্রহণযোগ্য তন্ত্র বলে মনে করা হচ্ছে বুদ্ধের কাছে সেই গণরাজ্য বাবস্থাই ছিল পছন্দসই। জন্মে ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক শাক্যকূলে। বুদ্ধত্ব অর্জনের পর একটা বড়ো সময় কাটিয়েছেন আরেক প্রজাতন্ত্রিক রাজ্য বৈশালীতে। মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত আগের বর্ষাযাপনের কয়েক মাস ও অতিবাহিত হয়েছে প্রিয় বৈশালীতেই। তাঁর জীবদ্দশায় শাক্য, কোলিয়, মল্ল, ব্যজ্জি, যাদব ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের উপস্থিতি ছিল এ দেশে। এর মধ্যে আবার বৌদ্ধ প্রজাতন্ত্রগুলোয় বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে কোন শাসক মনোনয়নের প্রথা ছিল না। নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধানরা বাছাই হতেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁকে গন্ত্রী, গণপরিষদ ও অন্যান্য কিছু বিধিবদ্ধ সংস্থার নির্দেশনা (গাইড লাইন?) মেনে চলতে হত। অর্থাৎ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় নয় ছয়? উঁহু, সেটি হবার যো ছিল না।

বুদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠভাবে মানুষের সমস্যাগুলিকে বুঝতে চেয়েছেন। উত্তরণের পথ খুঁজতে চেয়েছেন করুণা ও কল্যাণের লক্ষ্যে। তাঁর ধর্মের প্রতীত্ব সমুৎপাদবাদ - হ'ল কার্য কারণ তত্ত্ব (Theory of Dependent Origination)। এর অর্থ 'কোন কিছুকে প্রাপ্ত হয়ে বা অবলম্বন করে অন্য কোন কিছুর উদ্ভব।' শাক্য বংশীয় সিদ্ধার্থ জরা-ব্যাধি-মৃত্যু স্বরূপ জাগতিক দুঃখ নিরীক্ষণ করেছেন। তাঁর মতে দুঃখে আছে (দু কেথ লোকে পতিটিঠত); অতএব দুঃখের কারণ আছে। সুতরাং কারণের নিরসন সম্ভব। এবং তা এই জীবনেই। ব্যক্তিগত দুঃখ যে ক্রমবর্ধমান হয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অশান্তি ও বিপর্যয় ডেকে আনে সে কথাও বুদ্ধের দেশনায় স্থান পেয়েছে। যুদ্ধে যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না তাও উপলব্ধি করেছেন। ধর্মপদে তিনি জানিয়েছেন - জয় আনে ঘৃণা, কারণ বিজিত পক্ষ অন্তরে দুঃখ নিয়ে জীবন যাপন করে; জয় কিংবা পরাজয়ের ঊর্ধে শান্তচিত্ত মানুষই শান্তিতে বাস করে।

দুঃখ অপনোদনের জন্য ব্যক্তির আচরনীয় সৎবাক্য, সৎকর্ম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেছেন। পাশাপাশি তাঁর সাম্যচিন্তা ও স্বাধীনতার ধারণাটি নেহাৎ ব্যক্তিগত নব বরং গোষ্ঠী বা গণগত। বলা চলে রাষ্ট্রিক।

আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ ভাবনায় বুদ্ধের দর্শন, চিন্তা ও দেশনা ক্রমশই আরো বেশি বেশি করে প্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতির গবেষক ও চিন্তাবিদরা বুদ্ধের দেশনায় ডুব দিয়ে মুক্তো সন্ধান করছেন। ভোগবাদী ও হিংসাশ্রয়ী এই পৃথিবীতে বিপুল ধনবৈষম্য, হিংসা, অপরাধ প্রবণতা, যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রভৃতি বিবিধ সংকট থেকে সমাধানের পথ খুঁজতে চেষ্টা করেছেন বুদ্ধের হাত ধরে। সবুজ বৌদ্ধধর্ম (Green Buddhism), কর্মবন্ধ বৌদ্ধধর্ম (Engaged Buddhism), কর্মবন্ধ বৌদ্ধধর্ম (Engaged Buddhism), প্রায়োগিক বা ফলিত বৌদ্ধধর্ম (Applied Buddhism), ইত্যাদি নামে চলেছে বুদ্ধচর্চা। নবপর্যায়ের, নব প্রেক্ষিতে। বাঙালীর পক্ষে সুখের কথা — এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধ পন্ডিত ও গবেষক ডঃ দীপক কুমার বড়ুয়া একটি উজ্জ্বল নাম। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিষ্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ২০০৫ সালে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে সেখানকার 'অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'র আহ্বানে 'আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার প্রেক্ষিতে ফলিত বৌদ্ধধর্ম' শীর্ষক বিষয়ে শ্রী বড়ুয়া গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণ করেন। ' ৯৮ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার আয়োজিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল বুদ্ধিষ্ট অ্যাপ্রোচ টু ইকনমিক্স অ্যান্ড ডেভালপমেন্ট'। বক্তৃতা সভায় পন্ডিত চন্দ্রিম বিজবন্দর বলেন — ''বুদ্ধের মতো, দারিদ্র ব্যক্তিগত ও সমাজগতভাবে ক্ষণস্থায়ী।'' —অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় দারিদ্রের অবসান ঘটানো যে সম্ভব, বুদ্ধের বাণী ও দেশনা থেকে তা স্পষ্ট। পশ্চিমী পন্ডিত জোহান গ্যালাতুঙ্গ তাঁর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ — 'বুদ্ধিজম ঃ এ্যা কোয়েস্ট ফর ইউনিটি এন্ড পিস' -এ ধনবৈষম্য হ্রাস ও ক্ষুদ্র অপরাধ নির্মূলের মতো সমস্যা নিরসনে বুদ্ধের পথ নির্দেশের কথা বলেছেন। 'ইকনমিক্স ইন বুদ্ধিজম' শীর্ষক প্রবন্ধে গল্লে উদিত মহাথের জানিয়েছেন - তিনি (বুদ্ধ) বুঝতে পেরেছিলেন, দারিদ্র হল এক সামাজিক ব্যাধি বা অভিশাপ, যা দূর করা যেতে পারে মঙ্গলকর অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগের দ্বারা।

বুদ্ধ উপদেশ সমন্বিত কুঠদন্ত সুত্তে বলা হয়েছে অপরাধীকে কারাদন্ড, জরিমানা কিংবা মৃত্যুদন্ড দিয়ে ডাকাতি, লুঠতরাজ, হত্যা, হয়রানি —ইত্যাকার অপকর্মের অবসান ঘটানো যাবে না। 'চক্কবিত্তি সীহনাদ সুত্তন্ত' -এ তিনি বলেন– যাঁরা দরিদ্র তাঁদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে রাজাকে। উপযুক্ত কর্মসংস্থান করতে ব্যর্থ হলে যে রাজ্যে দারিদ্র, ডাকাতি, লুঠতরাজ, হত্যা, হয়রানি ও সর্বোপরি বিশৃঙ্খলা বাড়বে সে কথা বলা হয়েছে। হোম - বলি - যাগযজ্ঞ-বিরোধী বুদ্ধের মতে, অভাবী মানুষের জন্য রাজ্যের সর্বত্র দানছত্র খুলে যদি তাদের দুঃখ মোচন করা যায় তবে তা-ই হবে মহৎযজ্ঞ। 'কল্পদ্রুমাবদান' -এর উপর আধারিত রবীন্দ্রনাথের ' 'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় পাই—

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
''ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা

তোমরা লইবে বল কেবা।”

‘দীঘনিকায়’ - এ রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপনের জন্য কৃষকদের বিনামূল্যে ধানবীজ বিতরণ, ব্যবসা - বাণিজ্যে উদ্যোগীদের মূলধন সংগ্রহে সহযোগিতা এবং সরকারী কাজে ইচ্ছুক যোগ্য বক্তিদের উপযুক্ত বেতনের বিনিময়ে কাজে নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। রোজগারী ব্যক্তিদের দেয় করের মাধ্যমে রাজকোষ পূর্ণ হবে এবং জনগণ শান্তিতে বাস করার পরিবেশ লাভ করবে। রাজতান্ত্রিক এমন কি বর্তমানের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে অংশগ্রহণ মূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যস্থার পক্ষপাতী ছিলেন বুদ্ধ। ইতোপূর্বে আলোচিত বজ্জিদের উদ্দেশ্যে অপরিহানিয় সপ্ত-বিধানের মধ্যে প্রথমেই একতাবদ্ধ ভাবে বৈঠকে সম্মিলিত হওয়া ও কর্তব্য সম্পাদনার কথা রয়েছে। অর্থাৎ বহুজনের সুখের নিশ্চয়তা মিলতে পারে বহুজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই। বর্তমানে ‘ইনক্লুসিভ সোসাইটি’র ধারণা। আর এই সূত্রেই এসে পড়ে সমানাধিকারের প্রশ্নও। আরো পরবর্তীতে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকা সাম্যের ধারণা বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করে জনমানসে। কিন্তু কোন পথে সাম্য? উত্তরে সমাজতান্ত্রিক শিবির শ্রমিক শ্রেণির (প্রলেতারিয়েত) এক নায়ক তন্ত্রের নিদান দিয়েছেন। বাস্তবে দেখা গেল সব ধরণের একনায়কত্বের ধারণার একে একে গ্রহণ যোগ্যতা হারাল। বস্তুত, বলপ্রয়োগ ছাড়া সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগেও সমানাধিকার রক্ষা করা গেল না। অথচ সমানাধিকারের ধারণাটিকে ঝেড়ে ফেলাও সম্ভব হল না। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই পরম কারুনিক বুদ্ধের ব্যবস্থাপত্রের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন, ডাঃ বি. আর. আম্বেদকার যেমন বলেছেন — বুদ্ধ একনায়কত্ব ছাড়াই সংঘে সাম্যবাদ স্থাপন করেছিলেন। হয়তো এ ছোট আকারের সাম্যবাদ। কিন্তু এ একনায়কত্বহীন সাম্যবাদ। এ এক অলৌকিক ঘটনা, যার সাধনে লেনিন ব্যর্থ হয়েছেন (প্রবন্ধ - বুদ্ধ অথবা কার্ল মার্কস)

মহাপরিনির্বাণ কালে প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বুদ্ধ বলে যান — মানবজাতির প্রতি তার অন্তিম অভিজ্ঞান

তস্মা ইহ আনন্দ।

অত্তদীপ বিহরথ, অত্তসরণা অনঞ্ঞ ঞশমঅ

দর্মদীপা ধর্মসরণা অনঞ্ঞ্ ঞসরণা (মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত)

সুতরাং আনন্দ! নিজেই নিজের প্রদীপ হও। নিজে নিজের শরণ নাও। বাহিরের কারোর শরণ নিও না। সত্যের শরণ গ্রহণ কর।

মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ও বিচার বুদ্ধির ওপর আস্থা রেখে গেছেন বুদ্ধ। এমন সমাজ ও রাষ্ট্রের কথা ভেবেছেন যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির লক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এভাবেই গড়ে উঠতে পারে প্রকৃত নাগরিক সমাজ। নাগরিকের ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে রাজি থাকতে হবে রাষ্ট্রকে। তবেই তৈরি হতে পারে গণতন্ত্রের রক্ষা কবচ। উন্নত নাগরিকই জন্ম দিতে পারে উন্নত সমাজ ও সমাজব্যবস্থার। অতএব বুদ্ধকে কেবলমাত্র ‘অহিংসার মহান প্রচারক’ —ছাপ দিয়ে পূজার বেদিতে সাজিয়ে না রেখে ‘রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞানী’ বুদ্ধের মহান ভাবনাগুলির প্রয়োগ ঘটাতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামেয়। এ নিয়ে সর্বত্তরে ভাবনা চিন্তা শুরু হোত

ঋণ স্বীকার - ডঃ দীপক কুমার বড়ুয়া।